ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৫

(মুহাম্মাদ সা. ও সাহাবিদের জীবনী)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

সর্বশেষ বার্তাবাহক

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা	১৫
কুরাইশ কারা ছিল	২০
মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম	২৫
যুবক এক ব্যবসায়ী	৩২
আল্লাহ কীভাবে তাঁর নবিদের বাছাই করতেন	৩৮

অধ্যায়-২

সংগ্রামের সূত্রপাত

সর্বাগ্রের সেনানীরা	৪৯
মক্কাবাসীর নির্যাতন	৫৬
আবিসিনিয়ায় হিজরত	৬৭
আকাবার শপথ	৮২

অধ্যায়-৩

মুসলিম জাতির আবির্ভাব

নতুন যুগে প্রবেশ	৯১
একটি শহরের পুনর্নির্মাণ	১০০
বদরের যুদ্ধ	১০৭
উহুদের যুদ্ধ	১১৫
আবারও ঝড়ের পূর্বাভাস	১২৫
এবার মদিনা অবরোধ	১৩১

অধ্যায়-৪

চূড়ান্ত বিজয়

মক্কা যেভাবে মুক্ত হলো	১৪৭
হুনাইন ও তাবুক	১৬২
দায়িত্বের পরিসমাপ্তি	১৭৭
নবিজির প্রতিচ্ছবি	১৮৪
উম্মে সালামা (রা.)	১৯৫
মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)	২০২
বিড়ালছানার ভক্ত যিনি	২০৬
ফাতিমা (রা.) : অমূল্য যে রতন	২১১
সালমান আল ফারসি (রা.)	২১৯
জুলাইবিব (রা.)	২২৭
আবু জর আল গিফারি (রা.)	২৩১
আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)	২৪০
আরও কয়েকজন সম্মানিত সাহাবি	২৪৭

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—একটি সভ্যতার অর্জিত সফলতা ছাপিয়ে যেতে আরও যে সকল সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকতে হয়।

ইসলাম কী

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের যেসব স্থানে মনুষ্য বসতি করে—এমন সব অঞ্চল ছিল সাম্রাজ্যগুলোর অধীনে। আর সাম্রাজ্যগুলো পরিচালিত হচ্ছিল স্বৈরাচারী ও আগ্রাসী শাসকদের দ্বারা। পশ্চিমা রোমান সভ্যতা নানাদিক থেকে বারবারিকদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর এশিয়া মাইনরের বিশাল এলাকাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাইজেন্টাইন রোমানদের একক আধিপত্য। মধ্যপ্রাচ্যে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাব, যা প্রাথমিকভাবে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হলেও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার সীমানাঘেঁষে পৌঁছে গিয়েছিল ফিলিস্তিন পর্যন্ত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষ অনেকগুলো রাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চীনে চলছিল হান রাজবংশের শাসন। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কারণে ততদিনে চীনা রাজবংশের শাসনেও নৈরাজ্য আর ফাটল দেখা দিয়েছিল। তবে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড়ো বিভেদ ও সংঘাত ছিল বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে। বাইজেন্টাইনরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিল খ্রিষ্টান আর পারসিকরা ছিল জরথুস্ত্র অর্থাৎ অগ্নিপূজারি। প্রায়শই এ দুই পরাশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে যেত। একে অন্যের ভূখণ্ড দখল করার কিংবা কৌশলগত ফায়দা হাসিল করার চেষ্টার অন্ত রাখত না।

বেশিরভাগ সময় এ দুই পরাশক্তির যুদ্ধ হতো সিরিয়া, আর্মেনিয়ায় কিংবা ফিলিস্তিনে। শত শত বছর ধরে এ দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছিল। কোনো একটি যুদ্ধে হয়তো একপক্ষ জিতত, আবার আরেক যুদ্ধে হয়তো অন্যপক্ষ। তবে এসব যুদ্ধের পরিণতিতে এই সাম্রাজ্যগুলোর শহর আর জনজীবনের পরিণতি হয়ে উঠত অত্যন্ত নাজুক ও বিষাদময়।

স্থবিরতা থেকে শিক্ষা

তৎকালীন সময়ের পরাশক্তিগুলো যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজেই সিংহভাগ সম্পদ ব্যয় করত। তাই এ সাম্রাজ্যগুলোর অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যক্রম বিশেষ করে স্কুল পরিচালনা, চিত্রশিল্পী, পড়াশোনার মতো কাজের জন্য তেমন কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হতো না। ফলে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই লিখতে-পড়তে পর্যন্ত জানত না।

তাদের কাছে বইপুস্তক খুবই বিলাসী ও মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে সমৃদ্ধশালীরাই কেবল বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করত। স্কুল-কলেজেও ধনীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হতো। আর যারাও-বা স্কুলে যেত, কেবলই সীমাবদ্ধ থাকত ধর্মীয় শ্লোক ও সামান্য আচারাদি শিক্ষায়। কিশোরী বা মহিলাদের জন্য শিক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ মোটেই ছিল না।

নিত্যনতুন যা আবিষ্কৃত, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। গণিত বা নগর পরিকল্পনায় নতুন কোনো চিন্তায় কারও আগ্রহ ছিল না; বরং জব্দকৃত সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিল নির্মাণ কৌশল নিয়ে তৎকালীন রাজা-বাদশাহ বা সমরপতিদের আকর্ষণ ছিল।

পড়াশোনা বা অধ্যয়নের প্রক্রিয়াও হয়ে পড়েছিল একদম স্থবির। ভবিষ্যৎও ছিল বড্ড আঁধারে ঘেরা, অস্পষ্ট। মানবাধিকার বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না তেমন কোনো আইন-শৃঙ্খলা। ডাকাত বা জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য ছিল আশঙ্কাজনক। স্থানীয় নেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো লোকজনের কাছ থেকে উচ্চহারে কর আদায় করে নিত।

খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

তৎকালীন সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রধানত ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও ফিলিস্তিনে বিকশিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ স্থানেই খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে পালিত হতো, তার সাথে ঈসা (আ.) প্রচারিত শিক্ষার তেমন কোনো সাদৃশ্য ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্টধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করত ইচ্ছেমতো। ইচ্ছে হলেই বানিয়ে নিত নতুন নতুন সংঘ বা গির্জা। রোমান অধিপতিরা নানা স্থানে ক্যাথলিক চার্চ নির্মাণে সহযোগিতা করত। উল্লেখ্য, ক্যাথলিক শব্দের অর্থ হলো সর্বজনীন।

ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের ৪শ বছর পর। এই চার্চগুলোতে অনুশীলন ও অনুসরণ করা হতো পলের শিক্ষার আলোকে ত্রিত্ববাদের রীতিনীতি। ক্যাথলিক চার্চগুলোতে শেখানো হতো যে, ঈশ্বরের তিন রূপের বিস্তারিত বিবরণও সেই বিশ্বাস মজবুতকরণ।

প্রথমদিকে চার্চে বিশ্বাসীরা আরও কিছু অদ্ভুত ধারণায় বিশ্বাস রাখতেন। যেমন : শুধু চার্চের আনুষ্ঠানিক সদস্যরাই স্বর্গে যেতে পারবেন। তারা আরও মানতেন, চার্চগুলোর প্রধান অর্থাৎ পোপ

হিসেবে যিনি দায়িত্বপালন করতেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তার একনিষ্ঠ আনুগত্য করাও প্রয়োজন। তখনকার সময়ে বিশ্বাস করা হতো—পোপের সাথে ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগ আছে এবং পোপ কখনোই ভুল করতে পারেন না। পোপ চাইলে যে কাউকে স্বর্গে বা নরকে পাঠাতে পারেন। যাজকরা মানুষের পাপ মোচন করারও ক্ষমতা রাখেন বলে তখন দাবি করা হতো।

৩২৫ সালে ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল সন্নিবেশিত হয়। যারা চার্চের আনুষ্ঠানিক প্রথা বা রীতিতে বিশ্বাস করত, শুধু তারাই বাইবেল পড়ার অনুমতি পেত; বাকি লোকেরা বাইবেল স্পর্শও করতে পারত না। তারা জানতও না যে, বাইবেল পড়ার নিয়মনীতি কী। শুধু যাজকরাই জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন বাইবেলের আংশিক ব্যাখ্যা; যদিও তা মনগড়া। কিন্তু এর বাইরে জানার সুযোগও ছিল না জনসাধারণের।

চার্চে নারীদের অধিকার খুব সামান্যই বিদ্যমান ছিল। এখনকার সময়ের খ্রিষ্টান নারীরা যেমন বাইবেল একেবারেই মানে না, তখনকার সময়ে অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তৎকালীন সময়ে বাইবেলের একটি নিয়ম ছিল—নারীরা চার্চের ভেতর কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে পারবে না। সোনা-রুপা, হীরে-জহরত, মুক্তা বা অন্য কোনো অলংকার পরিধান করতে পারবে না। মাথায় স্কার্ফ না পরে কোনো নারী চার্চে প্রবেশ করত না। তারা চার্চে কোনো পদে যেতে পারবে না। সব সময়ই নজর রাখা হতো, যাতে পদায়নের মাধ্যমে নারীকে যেন পুরুষদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা না দেওয়া হয়।[১]

এসব বিবরণ পড়েই জনসাধারণের ওপর ক্যাথলিক ও চার্চগুলোর প্রভাব বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া চার্চগুলো জনগণের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের কর আদায় করত এবং ওই টাকা দিয়ে চার্চের দায়িত্বশীলদের জন্য ক্যাথেড্রাল ও বিলাসী বাসভবন নির্মাণ করত। কেউ যদি চার্চ প্রদত্ত শিক্ষাসমূহ অমান্য করার কথা ভাবত, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কাফির বা অবিশ্বাসী তকমা দিয়ে তার ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার।

[১] করিনথিয়ানস : ১৪ : ৩৪-৩৫, ১১ : ১-১০ তিমোথি-২ : ৯-১৫

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল সংকট ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে।

স্বপ্ন ও কুরবানি

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মের বহু বছর আগের কথা। মক্কায় আবদুল মুত্তালিব নামে একজন ব্যক্তি ছিল। তিনি কুরাইশ বংশের একজন সদস্য, তবে আর্থিকভাবে ছিলেন দরিদ্র। তাঁর গোত্রের নাম বনু হাশিম। এই বনু হাশিমের হাতেই শহরে আগত বণিক-ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমেই পানি শুকিয়ে যাওয়ার দরুন তারা বেশ সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।

যে জমজম কূপ থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা পানি আহরণ করত, তা টানা কয়েক শতাব্দী ধরে নিঃসন্ধান ছিল। হয়তো মরুভূমির ঝড় বা যুদ্ধ বা অন্য কোনো দৈব দুর্বিপাকের কারণে কূপের মুখটি মাটি ও বালিতে আটকে গিয়েছিল। পানি না পাওয়ায় বনু হাশিমকে শহরের উপপ্রান্ত থেকে বেশ কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করতে হতো।

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পাওয়ার জন্য আবদুল মুত্তালিব জমজম কূপটি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলেন। নানাজনের কাছ থেকে গল্প শুনে জমজম কূপের সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের কিছু ধারণা হয়েছিল। আর সে অনুযায়ী চেষ্টা শুরু করলেন তিনি। সন্তান আল মুগিরাকে নিয়ে তিনি গোটা মক্কার নানা স্থানে খনন করে গেলেন; কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও সুপ্রসন্ন হলো না তাঁর ভাগ্য।

একদিন রাতে ঘুমানোর পর তিনি স্বপ্ন দেখলেন—মক্কায় সবচেয়ে বড়ো দুটি মূর্তি যেখানে অবস্থিত, তার মাঝামাঝি একটি জায়গায় রয়েছে জমজম কূপটি। ঘুম থেকে উঠেই ছেলেকে নিয়ে ওই স্থানে গিয়ে শুরু করলেন খননকাজ। এভাবে খনন কাজ করতে করতে হঠাৎ অলৌকিকভাবে পেয়ে যান কূপের সন্ধান।

জমজম কূপটি পাওয়ার পর আবদুল মুত্তালিব অন্য একটি বিষয়ে বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লেন। জমজমের কূপটির নিয়ন্ত্রণ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে চলে আসায় তিনি এর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে পেরেশানিতে পড়ে গেলেন। কেননা, তাঁর পরিবার ছিল ছোটো এবং যোগ্য তেমন কোনো

উত্তরসূরিও ছিল না। তাই তিনি অনুভব করলেন, এ কূপটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর একদল যুবক দরকার। তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ যদি তাঁকে ১০ জন ছেলে সন্তান দান করেন, তাহলে কৃতজ্ঞতা হিসেবে তিনি একজন ছেলেকে কুরবানি করে দেবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা মূর্তিপূজা করলেও তারা আল্লাহ নামটির সাথেও পরিচিত ছিল। তবে আল্লাহকে তারা মানবিক সান্নিধ্যের বা মানবিক বিষয়াবলির অনেক ঊর্ধ্বে বলে মনে করত। তারা মনে করত, মূর্তিরাই বরং তাদের জন্য বেশি সহায়ক এবং তারাই তুলনামূলক বেশি সৌভাগ্য নিয়ে আসতে পারবে।[২] সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া তৎকালীন মক্কার বাস্তবতায় বেশ দুরূহ ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুআ কবুল করেছেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ১০ পুত্র সন্তানের জনক হয়। যেহেতু ১০ জন ছেলে হলে একজনকে কুরবানি করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাই তিনি এ প্রতিশ্রুতি রাখতে বাধ্যও ছিলেন। কিন্তু যা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো, তা হলো—কাকে তিনি কুরবানি করবেন? তাঁর সবগুলো ছেলেই ততদিনে সাবালক হয়ে উঠেছিল আর তাঁদের কেউই জীবন হারাতে রাজি ছিল না। এ কারণে তিনি তাঁর ছেলেদের নাম দিয়ে পরপর তিনবার লটারি করলেন আর প্রতিবারই নাম এলো আবদুল্লাহর। আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয়তম সন্তান।

যাই হোক, আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এককথার মানুষ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। তাই তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। যদিও অনেকেরই তাতে ঘোর আপত্তি ছিল। কেননা, তাঁর সবগুলো ছেলের মাঝে আবদুল্লাহই ছিল সবচেয়ে সততা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। তাঁরা এসে আবদুল মুত্তালিবকে বোঝাল, যাতে তিনি শিয়া নামক স্থানীয় ওঝা ও ধর্মযাজকের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে বিকল্প কোনো সমাধান পাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করেন।

শিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ এবং ১০টি উটের মধ্যে লটারি বা নির্বাচন গুটিকা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নির্বাচনী গুটিকায় যদি আবদুল্লাহর নাম ওঠে, তাহলে ১০টি উটের সঙ্গে আরও ১০টি উট যোগ করে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করতে হবে, যতক্ষণ না আবদুল্লাহর নামের স্থানে উটের নামটি আসে। তারপর উটের যে সংখ্যা নির্ধারক নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করা হবে, সেই সংখ্যক উট আল্লাহর নামে কুরবানি করতে হবে।

ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব উক্ত প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে পালন করে। আবদুল্লাহর নাম আসে ১০০তম উটের পরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর পরিবর্তে ১০০টি উট আল্লাহর নামে কুরবানি করেন।

[২] সূরা জুমার : ১-৩

মক্কাবাসীর নির্যাতন

একটু ভাবুন তো : *একজন মানুষ কখন, কীভাবে স্বৈরাচারী ও জালিম হয়ে ওঠে? একজন মানুষ যদি গরু বা কাঠের কোনো মূর্তির উপাসনা করে, আর আপনি তাকে এই বিভ্রান্তি বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে জানান, তাহলে সে কি আপনাকে আঘাত করতে পারে? এমন কিছু কি আপনি আদৌ প্রত্যাশা করেন? নির্যাতন করলেও কতটা সময় ধরে সে করবে? কতটা ভয়াবহ হবে ওই নির্যাতনের মাত্রা? যদি কেউ নিজ হাতে বানানো কাঠের কোনো মূর্তিকে নিজের প্রভু বলে মেনে নেয়, তাহলে তার চিন্তার গভীরতা বা প্রজ্ঞা কতটা গভীর বলে বিবেচিত হবে? সাধারণ অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতেই আপনি তার কাছ থেকে কতটুকুই-বা ইতিবাচকতা আশা করতে পারেন?*

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—মুহাম্মাদ (সা.)-কে যে রকম নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছিল।

দাওয়াতি কাজ

রাসূল (সা.) খুব ছোটো একটি গ্রুপের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি দুর্বল ও মজলুম মানুষদের মাঝেই দ্বীনি দাওয়াত প্রচার করেন। একদিন তিনি কাবার চত্বরে কিছু মানুষের সাথে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মক্কার কিছু প্রসিদ্ধ মানুষ সেখানে আসে।

মুহাম্মাদ (সা.) যেহেতু তুলনামূলক সমাজের নীচুস্তরের লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন, তাই মক্কার অভিজাত লোকেরা প্রাথমিকভাবে তাঁদের সাথে বসার আগ্রহ দেখায়নি। কারণ, তৎকালীন মক্কায় ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আভিজাত্য অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। তারা নবিজিকে বললেন—এসব দুস্থ লোকদের দূরে সরিয়ে দিতে, যাতে তারা কিছুটা সময় মুহাম্মাদ (সা.)-এর মুখ থেকে সরাসরি কিছু কথা শুনতে পারে।' তাদের বেশ আগ্রহও ছিল। অন্যদিকে, মুহাম্মাদ (সা.) নিজেও এ শহরেই মানুষ হয়েছিলেন।

তাই শহরের মানুষগুলোর চিন্তাধারা কীভাবে আবর্তিত হয়, তাও তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন। তিনি যখন কুরাইশ নেতাদের কথা রাখতে গিয়ে দুর্বল লোকদের সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, তখনই জিবরাইল (আ.) এসে তাঁকে কিছু ওহি শুনিয়ে গেলেন।

> ‘আর তাদের তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-বিকাল নিজের রবের ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন; নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।’[৩]

মুহাম্মাদ (সা.) এ আয়াতটি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করার পর অভিজাত লোকেরা স্থানটি ছেড়ে চলে গেল। ইসলাম দরিদ্রদের অভিজাতদের সাথে একসাথে বসার সুযোগ দিয়েছে—এ সত্যটি তাদের ভীষণভাবে আহত করল। তারা যখন জানল যে কারও বংশ পরিচয়, আভিজাত্য বা সম্পদ নয়; বরং ব্যক্তির তাকওয়াই হলো তার মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড, তখনও তারা বেশ হোঁচট খেলো।

এভাবে তিনটি বছর দাওয়াতি কাজ করার পর মাত্র ৩০ জন বা এর কিছু বেশি লোক ইসলাম কবুল করলেন। তাঁরা নিয়মিতভাবে আরকাম নামক একজন সাহাবির বাসায় জমায়েত হতেন। সেখানে যারা জমায়েত হতেন তাঁদের মাঝে নারী-পুরুষ, দুর্বল, সচ্ছল—সব ধরনের মানুষ ছিলেন। তখনকার সময়ে ক্রমাগতভাবে ইসলামের শিক্ষাসংক্রান্ত আয়াতগুলো নাজিল হচ্ছিল। কুরআনও তখন ধীরে ধীরে একটি কাঠামোগত রূপ লাভ করছিল।

মক্কার মূর্তিপূজারিদের কানে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কর্মধারা ও নতুন নতুন চিন্তা-কৌশল ঠিকই কানে আসছিল, কিন্তু তখনও অবধি তারা এগুলোকে কোনো হুমকি বলে মনে করেনি। কেননা, তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর এগুলো নতুন একটা কিছু করার প্রয়াস, যা সময়ের ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। এমনকি অনেক মক্কাবাসী ইসলামের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কারণ, ইসলামকে তারা কিছু মানবিক গুণাবলির সম্মিলন বলে বিবেচনা করেছিল। তাদের কাছে ইসলাম মানেই ছিল ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া, নারীদের সাথে পুরুষের মতো করেই সমাচরণ করা, এতিমদের প্রতিপালন, মূর্তি ভাঙা, গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করা, প্রতিদিন কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত করা এবং সততাকে একনিষ্ঠভাবে লালন করা।

কিন্তু ইসলামের শিক্ষাগুলো ছিল আরও অনেক বেশি ব্যাপক ও গুরুতর। মূর্তিপূজারিরা আধ্যাত্মিক আচারাদি হিসেবে একটি কাজই করত। তারা মূর্তির সম্মানে মাঝে মাঝে ছাগল বা দুম্বা বলি দিত। কিন্তু ইসলাম পরকালে পুনর্জাগরণের কথা বলে। দুনিয়ায় মানুষ যেসব কাজ করে যাবে কিংবা তাদের ঈমানের মান যেমন হবে, ওই অনুযায়ী তাদের জবাবদিহিও করতে হবে বলে ইসলাম সতর্ক করে দেয়। পরকালীন এ চিন্তাধারাটি তখনকার আরব সমাজে মোটামুটি অপ্রচলিতই ছিল।

---

[৩] সূরা আনআম : ৫২

প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ

রাসূল (সা.)-এর কাছে একবার ওহি এলো—‘আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।’[৪] এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের কাজটি পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ প্রকাশ্যে মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ শুরু করার বার্তা দেওয়া হয়।

এই হুকুম পালনের অংশ হিসেবে রাসূল (সা.) একরাতে আরবের সব সম্ভ্রান্ত লোকজন এবং নিজের আত্মীয়দের একটি ভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। এদের কারও কাছেই তিনি ইতঃপূর্বে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাননি। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি সকলের সামনে ইসলামের বার্তাটুকু প্রচার করলেন এবং মানুষকে তা মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন।

কিন্তু প্রবীণ কোনো ব্যক্তিই তা মেনে নেননি; বরং তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পাঁয়তারা করলেন। কিন্তু আলি (রা.) সেখানে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন এবং সকলের সামনে এককভাবে হলেও রাসূল (সা.)-এর সাথে থাকার ঘোষণা দিলেন। একজন কিশোর ছিলেন তিনি, আর সেখানে জাহেলি সমাজের সব হর্তাকর্তা উপস্থিত। চিন্তা করে দেখুন, কতটা সাহস থাকলে এভাবে কথা বলা যায়। যদিও তাঁর এ ঘোষণার পরও কুরাইশ নেতাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না; বরং তারা যে যার ঘরে চলে গেল। এ ঘটনার পর থেকেই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের অপমান করতে শুরু করলেন।

কিন্তু রাসূল (সা.) এসব অপমানের কারণে এক মুহূর্তের জন্য থেমে যাননি; বরং তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি শহরের প্রসিদ্ধতম পাহাড় সাফায় আরোহণ করলেন এবং চিৎকার করে সবাইকে ডাকলেন। যারা তখন বাজারে বা রাস্তাঘাটে ছিল, সবাই কৌতূহলী হয়ে তাঁর কথা শোনার জন্য সাফা পাহাড়ের নিচে এসে সমবেত হলো। তখন মুহাম্মাদ (সা.) বললেন—‘হে আমার কুরাইশ সদস্যরা! যদি আমি বলি—এই পাহাড়ের পেছনেই শত্রুপক্ষের একটি বাহিনী লুকিয়ে আছে, যারা আপনাদের ওপর আক্রমণ চালানোর পাঁয়তারা করছে, আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?’

[৪] সূরা হিজর : ৯৪